Journal of Rajshahi College
Rajshahi 6000, Bangladesh
www.rc.gov.bd
J R C

Open Access
ISSN 2959-8702

Original Article

বাংলা সাহিত্য ও পুঁথিপত্রের দর্পণে মোগল আমলে বাংলায় ধর্মীয় সমন্বয়ের ধারা

(Tradition of Religious Syncretism in Bengal During the Mughal Era as Reflected in Bengali Literature and Manuscripts)

সুব্রত রায়
(Sobrata Roy)

সহকারী অধ্যাপ ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
(Assistant Professor, Department of History, Shantipur College, WB, India)

Author's email: subratasntc@gmail.com

Received: 30 July 2024
Revised: 11 November 2024
Accepted: 20 December 2024
Published: 25 December 204

Volume 02
Issue 01
Page 1-10

Cite সুব্রত রায় (২০২৪) বাংলা সাহিত্য ও পুঁথিপত্রের দর্পণে মোগল আমলে বাংলায় ধর্মীয় সমন্বয়ের ধারা। *J. Raj. Col.* **2**(1):1-10.
https://doi.org/10.5281/zenodo.21862419

© 2024 The Authors.
Journal of Rajshahi College published by Rajshahi College, Rajshahi 6000, Bangladesh.
www.rc.gov.bd

ABSTRACT এই নিবন্ধটি মুঘল আমলে বাংলার হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যকার পারস্পরিক যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়া নিয়ে রচিত। মুঘল যুগে কীভাবে বাংলার সমাজে একটি মিশ্র বা সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল এবং সমসামযিক বাংলা সাহিত্য, পাণ্ডুলিপি ও মৌখিক ঐতিহ্যে এই বিষয়গুলো কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—তা এখানে বিশদভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে বাংলার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমবিকাশমান কাঠামোটি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে; পাশাপাশি তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বা আন্তঃসম্পর্ক এই গবেষণার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মূলশব্দ: বাংলা, মুঘল আমল, সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি, হিন্দু, মুসলমান, বাংলা সাহিত্য

This article is licensed under a *Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License*, which permits any non-commercial use, sharing, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if you modified the licensed material. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

১. ভূমিকা

বাংলায় মোগল শাসনের শুরু হয় ষোড়শ শতকের শেষ দিকে। মোগল আগমনের সূত্র ধরেই বাংলার সঙ্গে উত্তর ভারত এবং ক্রমে ক্রমে পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যএশিয়ার স্থলপথ বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। মোগলদের রাজনৈতিক আধিপত্যের পরিণতিতে বাংলার বাণিজ্যিক অর্থনীতির বিকাশের সূত্র ধরে এখানে দেশ বিদেশের বিভিন্ন বণিকরা এসে জাঁকিয়ে বসে। ফলে এই
বিদেশের বিভিন্ন বণিকরা এসে জাঁকিয়ে বসে। ফলে এই
ক্রমবিকাশমান অর্থনীতির মধ্যদিয়েই বাংলায় একটি মি শ্র সংস্কৃতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। সুপ্রাচীন কালথেকেই আমরা লক্ষ্য করেছি রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে ওঠে জৈবিক তাগিদে এবং এরা সভ্যতার অঙ্গ বিশেষ। সাহিত্য, স্থাপত্য ও শিল্পকলা এই সভ্যতার পরিশীলিত, সূক্ষ্ম অবদান। সামাজিক ইতিহাস লিখতে

গিয়ে এদের ইতিহাসের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া দরকার। সমাজের এই অংশের ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হওয়া আবশ্যক। তবে সাহিত্যে মানুষের আত্মার সন্ধান পাওয়া যায়। অতীতের ইতিহাসের আত্মার কাছাকাছি আসতে হলে সে যুগের সাহিত্যের আত্মার ভিতরে প্রবেশ করতে হবে [১]। ইতিহাস ও সাহিত্য হল সেই দুটি বিষয় যাদের কারবারই হল সময়কে নিয়ে। সাহিত্যিক বড় স্বাধীন। ঐতিহাসিক বড় বেশি বিচক্ষণ, বিবেচনাবাদী। একই সময়কে দু'জনেই লিপিবদ্ধ করছেন, একজন কল্পনার সাথে রঙিন সুতো পরাচ্ছেন, আর একজন সত্য প্রতিষ্ঠায় শুধুই দর্শক মাত্র। সাহিত্যিকের দায় নেই ঘটনার সত্যাসত্য সম্পর্কে কিন্তু একজন ঐতিহাসিক কি এই মহান দায়িত্ব এড়াতে পারেন? ঐতিহাসিক যেমন তার দায় এড়াতে পারেননা, তেমনি ঘটনার সত্যাসত্য সম্পর্কে সাহিত্যিকের দায় না থাকলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে সাহিত্য যে রূপে নির্মিত হয় তাকে আ শ্রয় করে ইতিহাস নির্মাণ করে চলেছেন বর্তমান কালের ঐতিহাসিকরা। মোগল আমলে বাংলায় রচিত অসংখ্য সাহিত্য ও পুঁথিপত্রে ছড়িয়ে আছে সেই সময়কার সামাজিক ইতিহাসের নানা ঘটনাপ্রবাহ। বাংলার ধর্মীয় সমন্বয়ের ধারা সাহিত্য ও পুঁথিপত্রের মাধ্যমে কিভাবে সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে তুলেছিল সেই বিষয়টিকে খুঁজে দেখার প্রচেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

৩. সামাজিক ইতিহাস নির্মাণে সাহিত্য ও পুঁথিপত্র

বাস্তবজগতের অনিবার্য কঠোর ঘাত-প্রতিঘাতে উদব্যস্ত মানব সাময়িক শান্তি সন্ধান করে মনঃকল্পিত এক সুউচ্চ জগতে- এর থেকেই হয়েছে সাহিত্য সৃষ্টি [২]। সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই, ইতিহাস সাহিত্যকে প্রাণিত করে, কখনও স্বীকৃত হয়ে, কখনও-বা উপেক্ষিত থেকে। উপেক্ষিত ইতিহাস অনেকটাই কাব্যে উপেক্ষিতার মতো, কেউ চিনিয়ে না দিলে চেনা যায় না। কবি-ঔপন্যাসিক-গল্পকার-প্রাবন্ধিক- এঁরা প্রত্যেকেই ক্রান্তদর্শী মানুষ। সচরাচর অজ্ঞানতা থেকে তাঁরা ইতিহাসকে উপেক্ষা করেন না। ইতিহাসের কোন ঘটনা, কোন মানুষ, কোন বিষয়, এমনকি কোন যুগকে যখন তাঁরা উপেক্ষা করেন তখন অনেকটা সচেতনভাবেই তা করেন। অনুরূপভাবে তাঁরা যখন কোন যুগ, যুগান্বিত মানুষ বা যুগপ্রবাহের ঘটনাকে গ্রহণ করেন, তা হয়তো বা সচেতনভাবেই করেন [৩]। অশীন দাশগুপ্তের মতে, 'ঐতিহাসিক সবসময় ঘটনার দর্শক, ঐতিহাসিককে বাদ দিয়ে ইতিহাস নেই। সাহিত্যিক কিন্তু স্রষ্টা, ঈশ্বরের মতোই অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে [৪]।' সাহিত্যিকের সুবিধা হল তিনি ঘটনার সত্যরূপের উর্ধ্বে উঠতে পারেন। কারণ তাঁর কল্পনার স্বাধীনতায় কারুর হস্তক্ষেপ নেই। কিন্তু ঐতিহাসিকের নেই কবির মতো কল্পনার স্বাধীনতা, দার্শনিকের মতো বিশ্বজনীন তত্ত্ব নির্মাণের অধিকার, শিল্পীর মতো অপরূপকে মূর্ত বা বিমূর্ত রূপ দেওয়ার আকুতি, বৈজ্ঞানিকের মতো প্রাকৃতিক বিধান আবিষ্কার ও প্রয়োগের অভীপ্সা। তবে ঐতিহাসিকের সঙ্গে সবারই লেনদেন আছে [৫]। সাহিত্য দিচ্ছে ইতিহাস নিচ্ছে এই দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কের চেয়েও অনেক বেশি নৈকট্য ছিল তাদের, ছিল একাত্মতা [৬]। কিন্তু যখন দুয়ের মোটামুটি একটি বিচ্ছেদ ঘটল, অর্থাৎ প্রত্যেক সংস্কৃতিতে এমন সময় হল যখন দু-পক্ষ নিজেদের উদ্দেশ্যের ভিন্নতা সম্বন্ধে একটি ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করল তখনও এই দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক শেষ হল না [৭]। অর্থাৎ সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক থাকছেই। একসময় যদি সাহিত্য উত্তমর্ণের ভূমিকা নিয়েছে, তো আজ সে মূলত অধমর্ণ, বিবর্তনের সূত্রে দুয়ের মিথস্ক্রিয়ার চরিত্র বদলেছে [৮]। কিন্তু আরও দু-এক জায়গায় ইতিহাসকে হয়তো এখনও সাহিত্যের কাছে হাত পাততে হয়। তা হল সাহিত্যের মৌখিক পরম্পরা বা oral tradition- লোকসঙ্গীত, জনশ্রুতি, কিংবদন্তি, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া ইত্যাদি- যার মধ্যে অনেক সময় ছিন্নবিচ্ছিন্ন কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক স্মৃতি ধরা থাকে। এই স্মৃতি ঐতিহাসিকের কাছে মূল্যবান হয়ে ওঠে কোন সমাজ বা ঘটনা বা ব্যক্তির কীর্তিকলাপের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরি করার জন্য [৯]। সাহিত্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা সমাজ-দর্পণ বা সমাজচিত্র। কোন স্থান ও কালের সমাজ জীবনে যে উত্থান-পতন, যে দ্বন্দসন্ধি ঘটে, যে হাসি-কান্না দেখা দেয়, যে প্রেম বিরহ যে আনন্দ-বেদনা জাগে, যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়, তার স্থায়ী দর্পণ হল তখনকার সেই স্থানের সাহিত্য। অতএব সেই সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শৈল্পিক, দার্শনিক অবস্থা প্রভৃতির একমাত্র পরিচায়ক হল তার সাহিত্য [১০]। যদিও কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ও কোন পদ্ধতির মাধ্যমে ইতিহাস রচনা করা অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানসন্মত, অথবা, বিজ্ঞান এবং যুক্তিসন্মত ইতিহাস রচনার জন্য ঐতিহাসিকের কোন দৃষ্টিকোণ এবং পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন-বিতর্ক বাহুল্যের মধ্যেও এ প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে সাধারন পাঠক আজও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভ্রান্ত [১১]। তবে আশার কথা সাম্প্রতিককালের ইতিহাস গবেষণায় বিভিন্ন প্রকার পুঁথিপত্রের পাশাপাশি সাহিত্যিক ও মৌখিক সূত্রসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আকর হয়ে উঠছে।

একথা সত্য যে সাহিত্যের ভিত্তিতে ইতিহাসের নির্মাণ সম্ভব। কারন, ইতিহাস অবলম্বনেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি। অনেকক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কবিতা-ছড়াগুলিই ইতিহাসের অন্যতম উপাদানরূপে গৃহীত হয়েছে এবং অন্য উপাদানের অভাবে ঐতিহাসিক কবিতা অবলম্বনেই ইতিহাসের তথ্য নির্ণীত হয়েছে [১২]। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কল্প-সাহিত্য ঐতিহাসিক-সাহিত্য ও বাস্তব-সাহিত্যের মধ্যে সৃষ্টিগত ও উপাদানগত তারতম্য অবশ্যই আছে। বর্তমান নিবন্ধে আমরা মোগল আমলে বাংলায় রচিত বিভিন্নপ্রকার সাহিত্য, পুঁথিপত্র,

মৌখিক-পরম্পরা এবং অন্যান্য তথ্যের নিরিখে বাংলায় ধর্মীয়-সমন্বয়ের উপেক্ষিত দিকগুলিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করব। কারণ আমরা মনে করি, মত ও পথ, পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণের বেষ্টনীতে ইতিহাস ও ঐতিহাসিককে সীমিত করার অর্থ সেই সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতির অপকর্ষ, সেই আলোকোজ্জল ভবিষ্যতের অপমৃত্যু। প্রকৃত চিন্তাশীলেরা তাই ইতিহাসকে বিশেষ মত ও পথ, বিশিষ্ট পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণের মধ্যে সীমিত করার তথ্যে স্বীকৃতি জানাতে পারেন না [১৩]। সেই কারনেই আমরা দেখতে পাই সাম্প্রতিক কালে ইতিহাসচর্চায় লেখ্যাগারের দলিল দস্তাবেজ ও সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের পাশাপাশি, সাহিত্য, মৌখিক পরম্পরা বা oral tradition, লোকসংগীত, জনশ্রুতি, কিংবদন্তি, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া ইত্যাদি ইতিহাস গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ আকর হিসাবে স্বীকৃত হচ্ছে, যার পরিণতিতে উন্মোচিত হচ্ছে ইতিহাসের নতুন নতুন অভিমুখ।

ইতিহাস চর্চ্চার প্রণালী সম্পর্কে আলোচনায় যদুনাথ সরকার বলেছিলেন, "ইতিহাস চর্চ্চার যাহা শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা বৈজ্ঞানিক পন্থা। দেশকালভেদে বা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে এই পন্থাটি ভিন্ন হয় না, কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রের সকল বিভাগেই ইহা সমান কার্য্যকর, এবং সর্ব্ববিধ সত্যের অন্তরে ইহা নিহিত রহিয়াছে [১৪]।" ইতিহাস তাহলে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "ইতিহাস কাব্য নহে। চিত্তবিনোদন ললিত আখ্যান অথবা শুষ্ক গবেষণাই ইহার চরম ফল নহে। ... ... অতীত-হইতে-উদ্ধার-করা সত্য ও দৃষ্টান্তের দীপশিখা আমাদেরই ভবিষ্যতের পথে রশ্মিপাত করিবে। ইহাই ইতিহাস চর্চ্চার চরম লাভ [১৫]।" ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় অন্যত্র তিনি আমাদের সাবধান করে বলেছেন, "ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলিলে ভুল হইবে। ইতিহাস প্রণালীতে বিজ্ঞান হইলেও বাহ্যকলেরবে এবং অন্তরের উদ্দ্যেশ্যে সাহিত্যকলা [১৬]।" এমনকি "ঐতিহাসিকের পক্ষেও কল্পনাশক্তির আবশ্যক [১৭]।" বলে তিনি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই ইতিহাসতত্ত্বের সমালোচনা করে মমতাজুর রহমান তরফদার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "ইতিহাসের দর্শন বলতে স্যর যদুনাথ সরকার যা বুঝেছেন, তার অর্থ অত্যন্ত অগভীর [১৮]।" কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, যে সময়ে দাড়িয়ে যদুনাথ সরকার মধ্যযুগের বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস চর্চায় নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকারের তথ্যের প্রয়োগ ও বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে যে ইতিহাস তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন সেই ধারা কে অনুসরণ করেই মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসচর্চা গতিলাভ করেছিল এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে বেশকয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থের, বিশেষ করে বাংলায় লেখা ক্ষিতিমোহন সেনের *ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা* [১৯], শশীভূষণ দাসগুপ্তের *ভারতীয় সাধনার ঐক্য* [২০], সুকুমার সেনের *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী* [২১], কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যযুগে বাংলা [২২], জগদীশ নারায়ণ সরকারের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক (মধ্য যুগ) [২৩], কিংবা সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত মুসা কালিম- এর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক [২৪] ইত্যাদি গ্রন্থের পাশাপাশি ইংরেজিতে প্রকাশিত অসীম রায়ের Islamic Syncretic Tradition in Bengal [২৫], জগদীশ নারায়ণ সরকারের Hindu-Muslim Relations in Medieval Bengal ও Thoughts on Trends of cultural contact in Medieval India [২৬] এবং মোহাম্মদ শাহনূরুর রহমানের Hindu-Muslim Relations in Mughal Bengal [২৭] ইত্যাদি গ্রন্থে আমাদের উল্লেখিত বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হলেও উল্লেখিত গবেষণায় সমকালীন বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য, পুঁথিপত্র, লোকপরম্পরা এবং মৌখিক সূত্রের যথাযথ ব্যবহারের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই কারণেই বর্তমান গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে আমরা ইতিপূর্বে ধর্মীয়-সমন্বয়ের অনালোচিত বিভিন্ন দিক সমূহকে যথাযথ ভাবে খোঁজবার ও বোঝবার চেষ্টা করেছি।

৪. মোগল আমলের সাহিত্যে বাংলার সমাজ চিত্র

মোগল শাসনে বাংলার অধিকাংশ জনগণ গ্রামে বাস করলেও এই সময়েই নাগরিক সমাজের বিকাশ দ্রুত গতিতে ঘটেছিল। ফলে গ্রাম ও শহরের জনজীবনের গতিপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের পাশাপাশি ধর্মীয় বিন্যাসের প্রতি যথাযথা গুরুত্বদিয়ে আমাদের এই সময়ের সমাজ জীবনকে খুজতে ও বুঝতে হবে। কারণ সামাজিক দিক দিয়ে দেখা যায় যে ধর্ম ও আচারের পার্থক্য বশতঃ হিন্দু মুসলমান প্রতিবেশী হয়েও পৃথক পৃথক ভাবে বাস করত [২৮]। এর প্রমাণ "কালকেতু তার গুজরাট নগর পত্তন করে তার পশ্চিম অংশটি মুসলমানদের জন্য ছেড়ে দেন। এই অংশটির নাম হল হাসানহাটি [২৯]।" এম. এ. রহিমের মতে, "সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে যে, স্বামী স্ত্রী, বিশেষ করে সাধারণ লোকেদের মধ্যে সরলতা ছিল সে যুগের সামাজিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এটা বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে [৩০]।" কিন্তু এই সহজ-সরল মানুষগুলিকেই আবার পারস্পরিক বিবাদে জড়িয়ে পড়তে দেখি। গোয়ালা হিন্দুদের মনসাপূজা বন্ধ করতে গিয়ে কাজির দলবলের কথোপকথন পাই,

কালু মিঞা নাম টকিয়া জোলার পুত্র।
সে বলে, "মারি ফেলাও গোয়ালার গোত্র।"
তাহান্ খালাত ভাই, নাম হাজি মিঞা।
... ...
ভাই বলে, "হিন্দু মারিয়া কার্য নাই।

আগুন লাগায়্যা ঘর পুড়ি় কর ছাই [৩১] ।”

এই ঘটনার পর গোয়ালাগণ দলবল নিয়ে উক্ত আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয় এবং তাঁদের ঐ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে মনসাপূজা সম্পন্ন করেতে উদ্যত হয়। এই প্রতি-আক্রমণের বিবরণে কবি বলেছেন,

"ধর ধর, মার মার" বলে গোপগণে।
মিঞা সব পলাইল ভয় পায়্যা মনে।।
বনে ঝোপে গেল তারা লড়ালড়ি পাড়ি।
মিনা কাজি পলাইতে ধরিলেক বেড়ি।।
তারপরে ছাড়ি দিল দুর্বল দেখিয়া।
স্নান করি পদ্মা পূজে হরষিত হইয়া [৩২] ।

কাজির দলবল আপাতভাবে গোয়ালাদের আক্রমণে পিছু হঠলেও তাঁরা আবার সদলবলে সমরসজ্জায় সজ্জিত হয়ে পূজাস্থলে হাজির হয়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে এমনকি হিন্দুদের জাতিনাশের চেষ্টা পর্যন্ত করে।

ব্রাহ্মণের জাতিনাশ করিবার ছলে।
কর্ণেত কলিমা পড়ে যবন সকলে [৩৩] ।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে ভারতচন্দ্রের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি বাংলায় প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধের সময় মোগল সেনাপতি মানসিংহ ভবানান্দ মজুমদারের কাছথেকে সৈন্য ও রসদ পেয়ে প্রাণে বেচেছিলেন। এর স্বীকৃতি স্বরুপ মানসিংহ ভবানান্দ মজুমদারকে রাজ্য উপহার দেবার অঙ্গীকার করে তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যান। ঘটনাক্রমে মানসিংহের এই বাসনার কথা শুনে সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বয়ং হিন্দুধর্মের নিন্দা করে বলেন,

যতেক বামন মিছা পুঁথি বানাইয়া।
কাফর করিল লোকে কোফর পড়িয়া।
দেবী বলি দেই গাছে ঘড়ায় সিন্দুর।
হায় হায় আখের কি হইবে হিন্দুর [৩৪]।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও হিন্দুদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর কথা সম্রাট মানসিংহকে যে ভাষায় বলেছেন তা নিম্নরুপ,

আমার বাসনা হয় জত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই।
… … … … … … … … … … …
দেহ জ্বলি যায় মোর বামণ দেখিয়া।
বামণেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া [৩৫]।

হিন্দুদের প্রতি সম্রাটের এই মনোভাবের কথা শুনে সেখানে উপস্থিত ভবানন্দ মজুমদার ব্যাথিত হন এবং তিনি বিনয়ের সহিত সম্রাটকে বলেন,

মজুন্দার কহে জাহাঁপনা সেলামত।
দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত।।
হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত।।
পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে।।
… … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … …
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর [৩৬]।

এর পরেও কিন্তু সম্রাটের মন মজুমদারের প্রতি বিগলিত হল না বরং তিনি তাকে বন্দী করে হিন্দু দেবতার কৃপায় সে কিভাবে মুক্তি পায় তা দেখার অপেক্ষায় রইলেন। শেষপর্যন্ত ভবানন্দ মজুমদার দেবী অন্নপূর্ণার কৃপা লাভ করেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে ফরমান ও খেলাত [৩৭] প্রদান করেন।

হিন্দু-মুসলিম এই আপাত বিরোধের মাঝেও আমাদের আলোচ্য সময়কালে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় সমন্বয়ের একটি ধারা যে প্রবাহমান ছিল সেই বিষয়টিকেই আমরা এখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমাদের আলোচ্য সময়পর্বেই আমরা লক্ষ্য করি হিন্দুরা যেমন মুসলমানদের অস্পৃশ্য মনে করত, ম্লেচ্ছ বলে তাদের অন্নজল স্পর্শ করত না, তাদের সংস্পর্শ সবসময়ে এড়িয়ে চলত মুসলমান সমাজেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল [৩৮]। যবন হরিদাস বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলে মুলুকপতি তাঁকে বলেছিলেন,

কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন।
আমরা হিন্দুর দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত।
জাতি-ধর্ম লঙ্ঘি কর অন্য-ব্যবহার।
পরলোকে কেমত বা পাই বা নিস্তার [৩৯]।

এর উত্তরে যবন হরিদাস মুলুকপতিকে একেশ্বরের তত্ত্বকথা শুনিয়ে বলেন,

নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণ পুরাণে [৪০] ।।

এর বিপরীত চিত্র অর্থাৎ কখনও কখনও উচ্চ বর্ণের কোন হিন্দু যদি কোন লোভ বা লোভের বশে অথবা স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করত তবে তাতে বড় কেহ বাধা দিত না।

হিন্দুকূলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ
আপনেইগিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দুরা কী করে তারে যার যেই কর্ম্ম
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কী ধর্ম্ম [৪১]।

রামেশ্বরের শিবায়নে যে সমাজের ছবি পাওয়া যায় তা সর্বধর্ম, সর্বজাতি সমন্বয়ের। সেখানে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সকলের কথাই স্থান পেয়েছে। মহাদেব এই স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের ভেদাভেদ না মেনেই অবাধে বিচরণ করেন সব যায়গায়। কিন্তু অপরদিকে গৌরী সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই শিব যখন বাগদিনীর বাড়ি থেকে ফিরে নিজের বাড়িতে ঢুকতে যায় তখন গৌরী বলেন,

বাগদিকে লাজ নাই ঘরে ঢুকে মোর।
ছাল্যাপুল্যা ছুঁইলে ছুতুক হবে ঘোর।।
ভাল যদি চায়তো এখান হৈতে যাকু।
যেখানে রাখিয়া আল্যা বাগদিনী মাগু [৪২]।।

এ যেন কোন দেবতার স্ত্রীর কথা নয় সমকালীন এক গৃহবধূর অভিলাপ। আবার যৌথপরিবার কেন্দ্রিক গার্হস্থ্য জীবনের এক মনোরম চিত্রও আমরা রামেশ্বরের কাব্যে খুজে পাই। যা প্রমাণ করে মোগল আমলের সাহিত্যে ধর্মীয়-সমন্বয় ও সামাজিক ইতিহাসের নানা দিক বিবৃত হয়েছে।

৫. মোগল বাংলার সংস্কৃতি

বাংলার সংস্কৃতিতে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য সত্ত্বেও অবাঙালী সংস্কৃতির একটি ধারাও প্রবাহমান। ফলে বাঙালির ভৌম ও মানস সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একটা জগাখিচুড়ি ভাব দেখা যায়। তবে একাধিক জাতির সমন্বয়ে গঠিত বলে বাঙালির চরিত্র নানা বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশে আকর্ষক। ফলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতি ও সাহিত্যভাবনা বিশেষ কতকগুলি চিহ্নে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। আমাদের কাছে সঞ্চিত রয়েছে এমন অনেক সাহিত্যিক তথ্য যার সাহায্যে অনায়াসে মোগল আমলের বিকাশশীল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিমণ্ডলটিকে চকিতে বুঝে নেওয়া যায় [৪৩]। এই যৌথ সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার পরিণতি স্বরূপ, বাঙালি সংস্কৃতি হিন্দু, মুসলমান, উচ্চবর্ণের হিন্দু, নিম্নবর্ণের হিন্দু, বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল, আশরাফ, আতরাফ, বৌদ্ধ, খৃষ্টান- সবার সংস্কৃতি [৪৪]। আবার মোগলদের অধীনে ভারতবর্ষ সহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় বিভিন্ন শহরগুলি গড়ে ওঠার ফলে বাংলার সংস্কৃতির দুটি ধারা অর্থাৎ গ্রামীণসংস্কৃতি ও নাগরিকসংস্কৃতির ধারা বিরাজমান ছিল। সাহিত্যের বিবরণে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যগুলিতে আমরা গ্রামীণসংস্কৃতি ও নাগরিকসংস্কৃতির নানা বিবরণ পাই। সবচাইতে বড় বিষয় হল সাহিত্যের বিবরণে সামাজিক গতিময়তার [৪৫] বিষয়টিকে যে ভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা থেকেই বাংলার সামাজিক সমন্বয়ের একটি ধার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মোগল আমলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই ধারার প্রকাশ ছিল সর্বাধিক। মাখনলাল রায়চৌধুরী আকবরের ধর্মীয়নীতির কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, "many Hindu customs entered the Muslim harems permanently. As for instance, during the marriage of Salim with the daughter of Raja Bhagwan Das, many Hindu customs were observed such as lighting the fire and strewing dried rice on the litter...... Akbar had from the beginning a high respect for the Hindus [৪৬]." অর্থাৎ আমরা একথা বলতে পারি যে, মোগলযুগে ভারতের সংস্কৃতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাংলার ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমান একই সঙ্গে বসবাস করার ফলে সংস্কৃতির মধ্যে একটা ঐক্যের সূত্র গড়ে ওঠে যা বাঙালী সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা কে পরিপুষ্ট করেছিল।

৬. ধর্মীয় সমন্বয়

ধাতুগত অর্থে ধর্ম সমাজজীবনকে ধারণ করে, অর্থাৎ সামাজিক সংগঠনের ঐক্য, বিন্যাস ও ভারসাম্য রক্ষা করে। অসাধারণ ব্যক্তি-মানুষের নিরাভরণ সত্য-সন্ধান বা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাকে এই অর্থে ধর্ম বলা চলে না। প্রচলিত অর্থে ধর্ম বিভিন্ন সংজ্ঞাবিশিষ্ট ঈশ্বর, অবতার-পয়গম্বর, শাস্ত্র-শরিয়ৎ, মন্দির-মসজিদ-গির্জা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান, পাদ্রি-পুরোহিত-মোল্লা সম্প্রদায়, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় সংখ্যাগণনার অতীত ক্রিয়াকলাপ ও আচার-অনুষ্ঠান, পরলোকতত্ত্ব এবং দৈনন্দিন কৃত্যাকৃত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশ, কাল, জাতি নির্বিশেষে ব্যবহারিক ধর্মের এই একমাত্র রূপ। ধর্মপ্রাণ এই ভারতবর্ষে ইতিহাসের আদি পর্ব থেকেই অগণিত প্রাকৃতিক এবং অতি প্রাকৃতিক দেবদেবীর আবির্ভাব এবং সমাজব্যবস্থায় চতুর্বণ থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ শত শত 'জাতি'র উৎপত্তি ব্যবহারিক ধর্মের এই আনুষ্ঠানিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি প্রকট এবং বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে [৪৭]। তবে ধর্ম যে রাজনৈতিক চেতনা ও প্রগতির পরিপন্থী তা যে-কোনও দেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়। আমাদের ধর্মশাস্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মানবিক অধিকার বা স্বাভাবিক অধিকার বলতে যা বোঝায়, এদেশে ধর্মের নামে তা থেকে অধিকাংশ মানুষকে বঞ্চিত করেছে [৪৮]। কিন্তু ভারতে ইসলামের আগমনের ফলে ধর্মীয় সমন্বয়ের একটি নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল। এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে দাদু, কবির, নানক, শ্রীচৈতন্যের যে অবদান তা মোগল আমলে আরও পরিপূর্ণতা লাভ করে। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বরাবর ভারতে হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হয়েছে, তা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বাংলাদেশে এই সমন্বয়-প্রচেষ্টার নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে বিভিন্নরূপে ধরা পড়েছে। হিন্দু রাখাল বালকদের মনসা-পূজা বন্ধের জন্য গ্রাম ও শহরে কাজির নিষেধাজ্ঞার কথা ষোড়শ শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীদাস আমাদের শোনান। কাজির এই নিষেধাজ্ঞা শুনে মনসা-

পূজায় বিঘ্নকারীগণকে নিবৃত্ত করতে উদারমনের এক মুসলিম ব্যক্তির মুখ দিয়ে দ্বিজ বংশীদাসই আবার আমাদের শোনান,

তার মাঝে একজন জাতি মুসলমান।
সে বলে, "উচিত নহে, রাখ হিন্দুয়ান।।
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু-মুসলমানে।
যার তার কর্ম, সেই করে ধর্মজ্ঞানে।।
সকলের কুলাচার সৃজিলা গোঁসাই।।
পাষণ্ড হইয়া তাতে কোন কার্য নাই [৪৯] ।।"

সতের শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর শীতলামঙ্গল কাব্যে হিন্দু-মুসলিম যৌথ সাধনার কথা কাজির মুখদিয়ে আমাদের যেভাবে শোনান তা ধর্মীয় সমন্বয়ের এক অন্য দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কবির ভাষায়,

এখন বুঝিলেম ভাবি শীতলা পরম দেবী
পূজিব তাহার পদযুগ।
তিনি সকলের সার যতো ব্যাধি আদি তার।
নিন্দি অধম পায় দুখ।।
বিচার করিএ দেখি কোরাণ পুরাণ একি
সারদা বসতি সর্বঘটে।
হিঁদুকি মোচোলমানে পয়দা একই স্থানে
আচারেতে জুদাজুদা বটে [৫০]।।

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম লেখক সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর "জেবুল-মুলুক-শামারোখ" কাব্যে সমন্বয়ের ধারানাকে পরিপুষ্ট করার নিদর্শন দিয়েছেন এভাবে,

বিনত করিয়া বন্দি ফিরিস্তার পদ।
ছুন্নিকুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুকুলে নারদ।।
তক্ত সিংহাসন বন্দি আল্লার দরবার
হিন্দুকুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচার।
পএগম্বর সকলে বন্দি করিয়া ভকতি
হিন্দুকুলে দেবতা হেন হইলা প্রকৃতি।
হজরত আদম বন্দি জগতের বাপ
হিন্দুকুলে অনাদি নর প্রচার প্রতাপ।
মা হওবা জগত বন্দম জগত জননী
হিন্দুকুলে কালি নাম প্রচার মোহিনী।
হজরত রসুলে বন্দি প্রভু নিজ সখা
হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্যরূপে দেখা।
খোআজ খিজির বন্দম জলেতে বসতি
হিন্দুকুলে বাসুদেব শূন্যে যে প্রকৃতি।
আছাব্বা সকলে বন্দি নবীর সভাএ
হিন্দুকুলে দোওয়াদশ গোপালে ধেয়াএ।
আউলিয়া আম্বিয়া বন্দি রব্বানি কোরান
হিন্দুকুলে মুনিভাব আজ এ পুরান।
পির মুর্শিদ বন্দম ওস্তাদ চরন
হিন্দুকুলে গুরু যেন কর এ পূজন [৫১]।।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই পীর-কাব্য রচিত হতে শুরু করে। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে সত্যপীর কাব্য রচিত হয়েছে। বাংলা পীরসাহিত্যের অবির্ভাব কাল্পনিক পীর কাব্য দিয়ে। সত্যপীরই সেই কাল্পনিক পীর। সত্যপীর হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনকরী দূতস্বরূপ। কৃষ্ণহরি দাসের 'বড় সত্যপীর' ও 'সন্ধ্যাবতী কন্যার' পুঁথিতে সত্যপীরের আত্ম-পরিচয়ের উল্লেখ যে ভাবে পাই তা বেশ চমকপ্রদ। তিনি বলছেন-

হিন্দুর দেবতা আমি মুসলমানের পীর।
যে যাহা কামনা করে তাহারে হাসিল [৫২]।।

উল্লেখিত এই পীর-পীরানীগণের ব্যাপক প্রভাব ভাগীরথী নদীর দক্ষিণ প্রান্তের পূর্ব অঞ্চলে যেরূপ পড়েছিল, সমগ্র বঙ্গের আর কোথাও সেরূপ পড়েনি [৫৩]। বলে দাবী করা হলেও আমরা লক্ষ্য করি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক হিসাবে বাংলার প্রায় সর্বত্র সত্যপীরকে চিহ্নিত করা হয় [৫৪]। সত্যপীরের ঘটনা সমাজে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলেছিল। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বাঙালী নর-নারীর সমাজ-চিত্র এই পীর-সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রথম লিখিত আকারে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার সূত্রপাত হতে থাকে। পীর পাঁচালী কাব্যসমূহ হল তৎকালীন বাঙালী মুসলমান সমাজের সংস্কৃতির একমাত্র পরিচায়ক [৫৫]। পীর পাঁচালী কাব্যের ছত্রে ছত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও উচ্চ-নীচের ব্যবধান সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কুশল ঠাকুর নামের এক ব্রাহ্মণের পালিত পুত্র একটি কোরাণ কুড়িয়ে পেয়ে সেটি পড়তে আগ্রহী হয়। এর পর তাঁর আর তার বাবার কথোপকথনের মাঝে সত্যপীরের উপস্থিতিতে সমন্বয়ের যে সুর ধ্বনিত হয় তা নিম্নরূপ,

আমায় পড়াও বাপ কোরাণ কেমন
কথা শুনি স্তব্ধ হইল কুশল ব্রাহ্মণ।
কহিতে লাগিল ঠাকুর হয়ে ক্রোধভার
কি কারণে চাহিস তুই কোরাণ পড়িবার।
ব্রাহ্মণে কোরাণ পড়ে কোন শাস্ত্রে বলে
এই ক্ষণে কোরাণ ভাসায়ে দেহ জলে।
সত্যপীর বলে কোরাণ পড়িলে কিবা হয়
দ্বিজ বলে কোরাণ পড়িলে জাতি যায়। ....
এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই
সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোসাই। ....
সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয়
বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়।

কেহ কোন নদী বইয়া কোন দিকে যায়
সমুদ্রে যাইয়া সব একত্র মিশায়।
তেমন ছত্রিশ জাতি এক জাত হইয়া
একপথ দিয়া সবে যাবে মিশাইয়া [৫৬] ।।...

আনুমানিক ১২০১ বঙ্গাব্দে লেখা পুঁথিতে "আজদ্যার কেচ্ছা" নামে সত্যপীরপালার নুতন কাহিনী বীরভূমের রাজনগর এলাকার হরিশপুর গ্রাম থেকে উদ্ধার হয়। ঐ অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায় প্রথম সত্যপীরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই পালা অনুযায়ী,

দুনিঞাতে জত লোক আছে মোছলমানে।
সত্তপিরের কারামত তারা সবাই জানে।।
হিন্দু লোক নাহি জানে দেওান সত্তপিরে।
তেকারণে হিন্দুলোক পুজা নাহি করে [৫৭]।।

তবে পরবর্তীতে হিন্দুরা যে সত্যপীরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে সে কথাও আছে। মৈমনসিং-গীতিকায় চণ্ডালের ঘরে পালিত ব্রাহ্মণ সন্তান কঙ্ক পীরের অদ্ভুত কাণ্ড দেখে মোহিত হয়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে। এর পর কঙ্কের সম্পর্কে আমরা যে কথা পাই তা নিম্নরূপ,

তার পর জাতি-ধর্ম্ম সকলি ভুলিয়া।
পীরের প্রসাদ খায় অমৃত বলিয়া।।
দীক্ষিত হইলা কঙ্ক যবন পীরের স্থানে।
সর্ব্বনাশের কথা গর্গ কিছুই না জানে।।
জাতি-ধর্ম্ম নাশ হৈল রটিল বদনাম।
পীরের নিকটে কঙ্ক শিখিয়ে কালাম [৫৮]।।

পীরের শিষ্যত্ব গ্রহন ও মুসলমানী ধর্মশাস্ত্রের বচন সম্পর্কে কঙ্কের জ্ঞানার্জনে প্রসন্ন হয়ে পীর তাকে সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করতে নির্দেশ দেন। এই পাঁচালী অনুযায়ী,

হিন্দু আর মোসলমানে, সত্যপীরে উভে মানে,
পাঁচালীর হৈল সমাদার [৫৯]।।

বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে নানা ধরনের লোকগীতি ও বৈঠকীগান জনচিত্তে প্রধান ভূমিকা গ্রহন করেছিল [৬০]। আমাদের আলোচ্য সময়ের কিছু পরে রচিত হলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বুঝতে এগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক বলে আমরা এগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করবো। চট্টগ্রামের কয়েকজন মুসলমান কবির যে বিবরণ আমরা পাই তা হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ধারাকে যেমন পরিপুষ্ট করে তেমনি এই অঞ্চলের কবি মোহম্মদ খান ১৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচালীর আকারে রচিত তাঁর মুক্তাল হোসেন কাব্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখেন,

"হিন্দুস্থানে সব লোকে না বুঝে কিতাব।
"হিন্দুস্থানে সব লোকে না বুঝে কিতাব।
না বুঝিয়া না শুনিয়া নিত্য করে পাপ।।
তে-কাজে সংক্ষিপ্ত করি পাঞ্চালি রঁচিলু।
ভাল মতে পাপ পুণ্য কিছু না জানিলু [৬১] ।।"

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বাংলার ১৬২ জন বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলিম কবিদের যে সব পদসংকলন করেছেন সেগুলির মুল সুর হল কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে জাতি-কুলের উর্ধ্বে উঠে এক অনন্য ধর্মীয় ও সামাজিক সমন্বয়ের নজির তুলে ধরা। শ্রীহট্ট জেলার মুসলিম কবি আরকুম এর কথায়,

আজ কালার পিরিতে রে সাম আজ কালার পিরিতে,
জাতিকুল সরম ভরম সব দিলাম তার হাতে।
ভাই বন্ধু ইষ্টি কুটুম যা আছে জগতে,
সবে বলে কুল ডুবাইছি দাগ লাগাইছি জাতে।
... ...
কাজ নাই আমার কুল মানের, কাজ নাই আমার জাতের,
পাইলে সন্ন্যাসী হইয়া জাইমু তার সাতে [৬২] ।

এই মুসলিম কবি কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তাঁর জাতপাত ত্যাগ করে উপাস্যকে পাবার বাসনা জ্ঞাপন করে তাই বলেন, 'তুমি প্রভু আলেক সাই, আমার জাতি কুলের কার্য্য নাই [৬৩]। আর এক কবি আলি রাজার কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই, 'ভুমি আমি এক জাতি, জন্ম ভিন্ন হৈনু জ্ঞাতি, সে নিমিত্ত তোরে বুলি ভাই [৬৪]।' এই সৌভাতৃত্বের কথা আরও দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করে পাগল কানাই লিখলেন,

এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়।
সকলেরি এক রক্ত এক ঘরে আশ্রয়।।
এক মায়ের দুধ খেয়ে এক দরিয়ায় যায়।
কারো গায়ে শালের কোর্তা কারো গায়ে ছিট, দুই ভাইরে দেখতে ফিট্।
কেবল জবানীতে ছোট বড় বোবা বাচাল চেনা যায়।।
কেউ বলে দুর্গা হরি, কেউ বলে বিসমিল্লা আখেরি পানি খেতে যায় এক দরিয়ায়।
মালা পৈতে একজন ধরে, কেহ বা সুন্নত করে।
তবে ভাই ভাইয়ে মারামারি ক'রে কেন যাচ্ছিস গোল্লায় [৬৫]।

যশোর জেলার পাঞ্জশাহ ঐ জেলারই খোন্দকার নামক জনৈক সুফীপন্থি সাধুর কাছে দীক্ষিত হন। তার মতে,

শুধু কি আল্লা ব'লে ডাকলে তারে পাবি ওরে মন-পাগেলা
যেভাবে আল্লাতালা বিষম লীলা ত্রিজগতে করছে খেলা।।
কত জন জপে মালা তুলসী-তলা, হাতে ঝোলে মালার ঝোলা,
আর কতজন হরি বলি মারে তালি, নেচে গেয়ে হয় মাতেল।।
কত জন হয় উদাসী, তীর্থবাসী, মক্কাতে দিয়াছে মেলা

কেউ বা মসজিদে বসে তার উদ্দেশে সদায় করে আল্লা আল্লা।।
স্বরূপে মানুষ মিশে, স্বরূপ দেশে বোবায় কালায় নিত্য লীলা।
স্বরূপের ভাব না জেনে চামর কিনে হচ্ছে কত গাজীর চেলা।।
নিত্যসেবায় নিত্যলীলা চরণমালা, ধরা দিবে অধরকালা।
পাঞ্জ তাই ক'রে হেলা ঘটল জ্বালা, কি হবে নিকাশের বেলা [৬৬] ।।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যে বাংলার মোগল বাহিনীতে আমরা যোদ্ধা হিসাবে পর্তুগীজদের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করতে দেখি। বর্নসংস্কার মুক্ত এই পর্তুগীজদের অনেকে বাঙালী মেয়েদের বিবাহ করে এবং এদের সন্তানরা ফিরিঙ্গি জাতি হিসাবে পরিচিতি পায় [৬৭]। অষ্টাদশ শতকের শেষে জন্মগ্রহনকারী এই রকম এক ফিরিঙ্গি সন্তান হলেন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। তিনি নিজে খৃষ্টান হয়েও বাঙালি জাতির সামাজিক ব্যাধি সম্বন্ধে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে তিনি জাতিভেদ ও ধর্মীয় সমন্বয়ের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ করে বলেন,

খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিন্তু ভিন্ন নইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে
আমার মানব জনম সফল হবে যদি রাঙা চরন পাই [৬৮]।

ভোলা ময়রা কবি গানের মধ্যেদিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে জাতপাতের উর্দ্ধে উঠতে চেয়ে বলেছিলেন,

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা
ময়রাই বারোমাস।
জাতিপাঁতি নাহি মানি, ওগো কৃষ্ণ পদে আশ [৬৯]।।

সাধক কবি রামপ্রসাদ তাঁর গানের মধ্যদিয়ে সকলপ্রকার ধর্মীয়সাধনাকে একাকারকরে তাই গেয়ে উঠেছিলেন,

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজী।
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতেই তুমি হও মা রাজী।।
মগে বলে, 'ফরাতারা' 'গড়' বলে ফিরিঙ্গী যারা মা।
'খোদা' বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব বলে তুমি শৈবের উক্তি মা,
গৌরী বলে সূর্য্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকা জী।।
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা।
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালী যেনো এসব জনে।
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজী [৭০]।।

দিনাজপুর, রংপুর ও কোচবিহার অঞ্চলে বাউদিয়া সম্প্রদায়ের দেখা পাওয়া যায়। এরা সাধারণতঃ ঘর বাধে না। কোন সামাজিক সংস্কারেরও বড় একটা ধার ধারে না। সবচেয়ে মজার কথা হল এ সম্প্রদায়ের ভিতর প্রচলিত ধর্ম্ম নিয়ে কোন ভেদাভেদ নেই। এদের গাওয়া ভাওয়াইয়া গানে তাই বাউল, বৈষ্ণব এবং সাই দরবেশ ও সূফীদের ভাব ও সুর এক হয়ে মিশে গেছে। বাউদিয়া হল একটা সম্প্রদায় মাত্র, জাত নয় [৭১]। আবার আমরা লক্ষ্য করি যে বৈষ্ণবদের মধ্যে গুরুবাদের প্রাধান্যের দরুন যে গুরুরা ব্রাহ্মণ ছিলেন না বা তুলনামূলক বিচারে অশিক্ষিত ছিলেন, তাঁরা ক্রমশ অভিজাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে অপাংক্তেয় হয়ে যান। তাঁরা, অর্থাৎ নিম্নবর্গের গুরুরা, চৈতন্যের দোহাই দিয়ে 'কর্তাভজা', 'নিতাই রাধা', 'শিষ্যাবিলাসী', 'কিশোরী ভজন'-জাতীয় উপসম্প্রদায় সৃষ্টি করে, শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে, তেলি মালি জেলে কৈবর্ত কামার কুমোরদের মধ্যে, গুরুর ব্যবসা শুরু করেন [৭২]। এখন প্রশ্ন হল গুরু কে? এ সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃত- এর যে বক্তব্য পাই তা নিম্নরূপ,

কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র সন্ন্যাসী কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় [৭৩]।।

এই গুরুদের মহিমা প্রচার এবং গুরুর কৃপা লাভ করতে পারলেই সবকিছু থেকে পরিত্রান পাওয়া যে সম্ভব একথা সতের শতকে গুরুতত্ত্বসার পুঁথিতে বলরাম দাস বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। গুরুতত্ত্বসার অনুসারে, "উশ্চ কীবা নিচ জাতি ভজে জেই মম প্রতি মর অঙ্গে মিশ্রিত সে জন [৭৪]।" আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় বেশ কয়েকটি লোকধর্মসম্প্রদায়ের নাম আমরা পাই এদেরই একটি হল নদীয়া জেলার 'সাহেবধনী' সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা জাতিভেদ স্বীকার করে না; কি হিন্দু কি মুসলমান সকলকেই এরা নিজেদের সম্প্রদায়ের লোক হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। সাহেবধনীদের সবচেয়ে বড় গীতিকার কুবির গোঁসাই তাঁর একটি গানে হিন্দুমুসলমান ধর্মসমন্বয়ের চমৎকার বিবরণ যে ভাবে তুলে ধরেছেন তা নিম্নরুপ,

আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মা সার।
একহাতে বাজেনা তালি এক সুরের কথা বলি
নীরে ক্ষীরে চলাচলি বীজের এই বিচার।
পিতা আল্লা মাতা আহ্লাদিনী মর্ম বোঝা ভার [৭৫]।

প্রথম ধর্মান্তারিত বাঙালি খ্রিস্টান কৃষ্ণচন্দ্র পাল খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের আগে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তির আশায় কর্তাভজা ও গুরুসত্য সম্প্রদায়ের গুরুদের কাছথেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এই গুরুরা তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন জাতি না মানার এবং প্রতিমা পূজা না করার [৭৬]। এই ঘটনা গুলি প্রমাণ করে যে বাংলার গৌণধর্ম সম্প্রদায়গুলির কাছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বিভাজনের কোন স্থান ছিল না। অর্থাৎ মোগল আমলের বাংলা

যে সযত্নে ধর্মীয় সমন্বয়ের ধারাকে লালন করেছিল এ বিষয়ে কোন দ্বিমত পোষণ করা চলে না।

৭. উপসংহার

আমরা মোগল বাংলার ধর্মীয় সমন্বয়ের ধারার যে চিত্র উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছি তা থেকে স্পষ্ট যে কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান আপাত বিরোধের নজির সামনে এলেও আমাদের আলোচ্য সময়কালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দু-মুসলিম এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় সহ অন্যান্য ধর্মের সঙ্গেও এদের একে অপরের পারস্পারিক মিলন ও ঐক্যের ধারা বহমান ছিল। কিন্তু প্রশ্ন জাগে ঔপনিবেশিক শাসনকাল জুড়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে অধিকাংশ হিন্দু-মুসলমানের বিপরীতমেরুতে অবস্থান এবং স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে কলিকাতা ও নোয়াখালীর যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তা আমরা রোধ করতে পারলাম না কেন? আমাদের সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের ঐতিহ্যকে কি আমরা লালন করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম? না কি এ আমাদের ইতিহাস বিসৃতির পরিণাম অথবা কেবলই ক্ষমতা দখলের মোহের পরিণতি? সবচাইতে বড় কথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৬ বছর পেরিয়ে এসেও আমরা সেই ইতিহাস বিসৃত জাতি হয়েই থেকে যেতে চাইছি কি? কারণ আমাদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সম্প্রদায় ও অঞ্চলগত বিভাজন ও অসহিষ্ণুতা যখনই উকি দিয়েছে তখনই অতীতের উদাহরণকে সামনে এনে আমরা তার থেকে উত্তরণের দিশা কিন্তু খুজেছি এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা সফলও হয়েছি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে প্রাচীন ইতিহাসের বদলে ঈষধংংরপধষ ঐরংঃড়ৎু-র ধারণাকে যেভাবে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে এবং মোগল আমলের ইতিহাসকে পাঠ্যতালিকা থেকেই তুলে দেবার যে প্রবণতা আমরা লক্ষ্যকরছি তা যদি যথার্থই বাস্তবায়িত হয় তবে কি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যথার্থ ভাবে অতীতের ভারত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের পাশাপাশি মোগল আমলের এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস চেতনা থেকে বঞ্চিত হবে না? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার দায় পাঠকের।

তথ্যপঞ্জি

১। মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১) পৃ. ৬২।
২। শ্রীরমা চৌধুরী, "সাহিত্য ও সমাজ", *প্রবাসী*, ফাল্গুন ১৩৫৮, পৃ. ৫৮০।
৩। রঞ্জিত সেন, "সাহিত্য কী ইতিহাসকে মেনে চলে?", *ইতিকথা*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ানি ২০১৩, পৃ. ৩৮।
৪। অশীন দাশগুপ্ত, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, (কলকাতা: আনন্দ, ১৯৯৮), পৃ. ২৮।
৫। অমলেশ ত্রিপাঠী, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৬০), মুখবন্ধ।
৬। পবিত্র সরকার, *ইতিহাস ও সাহিত্য* (উত্তরা চক্রবর্তী ও সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত), (কলকাত: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১১), পৃ. ২০৮।
৭। তদেব।
৮। তদেব, পৃ. ২০৯।
৯। তদেব।
১০। গিরিশ নাথ দাস, *বাংলা পীর-সাহিত্যেও কথা*, (বারাসাত: শেহিদ লাইব্রেরি, ১৯৬০), পৃ. ১৩।
১১। কঙ্কও দত্ত, "ইতিহাস পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণের প্রশ্ন", *প্রবাসী*, আষাঢ়, ১৩৬৮, পৃ. ৩০১।
১২। সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইতিহাস আশ্রিত বাংলা কবিতা*, (কলকাতা: এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড, ১৩৬১), পৃ. ৩১।
১৩। কঙ্কও দত্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৫।
১৪। নিখিলেশ গুহ ও রাজনারায়ণ পাল (সংকলিত ও সম্পাদিত), *যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার*, (কলকাতা: এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড, ২০১১), পৃ. ৯।
১৫। তদেব, পৃ. ১৭।
১৬। তদেব, পৃ. ২১।
১৭। তদেব।
১৮। মমতাজুর রহমান তরফদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৭।
১৯। ক্ষিতিমোহন সেন, *ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা*, (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৭)।
২০। শশীভূষণ দাসগুপ্ত, *ভারতীয় সাধনায় ঐক্য*, (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৫৮)।
২১। সুকুমার সেন, *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি*, (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৩)।
২২। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে বাংলা*, (কমল চৌধুরী সম্পাদিত), (কলকাতা: দে'জ, ২০০২।
২৩। জগদীশ নারায়ণ সরকার, *হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক (মধ্যযুগ)*, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৪)।
২৪। এুসা কালিম, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক*, (কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮৮)।
২৫। Asim Roy, *Islamic Syncretic Tradition in Bengal*, (New Jersey: *Princeton University Press*, 1983).
২৬। J N Sarkar, *Hindu-Muslim Relations in Bengal (Medieval Period)*, (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i-Delhi, 1985) Ges *Thoughts on Trends of cultural contact in Medieval India*, (Calcutta: *OPS Publishers*, 1984).
২৭। Md. Shahnoorur Rahman, Hindu-Muslim Relations in Mughal Bengal. Progressive Publishers (Kolkata, 2001).
২৮। মমতা বৈষ্ণব, *রাঢ় বাংলার ইতিহাস ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য*, (বর্ধ মান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬), পৃ. ৪০।
২৯। সুকুমার সেন, *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩।
৩০। এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২), পৃ. ২৯৮।
৩১। আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পা. ও সং.), *বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা*, (এরপর থেকে *বাইশা* হিসেবে উল্লেখিত) (কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২), পৃ. ৬৯।
৩২। *বাইশা*, পৃ. ৭০।
৩৩। *বাইশা*, পৃ. ৭১।
৩৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, (এরপর থেকে *অন্নদামঙ্গল* হিসেবে উল্লেখিত), (কলকাতা: বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৭), পৃ. ৩৪২।
৩৫। *অন্নদামঙ্গল,* পৃ. ৩৪২।
৩৬। *অন্নদামঙ্গল,* পৃ. ৩৪৩-৩৪৪।
৩৭। এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, *অন্নদামঙ্গল,* পৃ. ৩৪৫-৩৬১। ফরমান সম্পর্কে জানতে দেখুন, মোহিত রায় (সম্পা.), *ক্ষিতিশ বংশাবলী চরিত,* (কলকাতাঃ মঞ্জুষা, ১৯৮৬), পৃ. ১৪৬।
৩৮। মমতা বৈষ্ণব, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪১।
৩৯। বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্য ভাগবত,* (কলকাতাঃ বসুমতি, ১৯৮৯), পৃ. ৮১।
৪০। *তদেব*।
৪১। *তদেব*।
৪২। রামেশ্বও ভট্টাচার্য, *শিবায়ন* (যোগিলাল হালদার), (কলকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২), পৃ. ২৭৪।
৪৩। সনৎকুমার নস্কও, "বাঙালির জাতিসত্তার নির্মাণঃ প্রেক্ষিত প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য", *ঐতিহ্য, The Heritage*, Vol. XII, Issue-1 (মার্চ-এপ্রিল ২০২১), পৃ. ১২৭। আরো দেখুন, সনৎকুমার নস্কর, *মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্যঃ আর্থ*-সামাজিক পটভূমি ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, (কলকাতাঃ রত্নাবলী, ১৯৯৫), পৃ. ২৫।
৪৪। গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি,* (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৬), পৃ. ১৪-১৫।
৪৫। এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, সুব্রত রায়, "মোগল আমলের বাংলা সাহিত্যেও দর্পণে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিময়তার ইতিহাস", *ঐতিহ্য, The Heritage*, Vol. XIV, Issue-2, (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩), পৃ. ৭১-১০৭।
৪৬। Makhanlal Roy Choudhury, *The Din-I-Ilahi or The Religion of Akbar*, (Calcutta: University of Calcutta, 1941), p. 144.
৪৭। জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ধর্ম ও প্রগতি* (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০০৯), পৃ. ১৩।
৪৮। তদেব, পৃ. ১৮।
৪৯। *বাইশা,* পৃ. ৬৯।
৫০। "শীতলামঙ্গল", সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য (সম্পা. ও সং.), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী* (কলকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১), পৃ. ২৬৩।
৫১। এুনশী শ্রী আব্দুল করিম (সং), *বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ,* ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা (কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২০), পৃ. ৫৭।
৫২। গিরিন্দ্র নাথ দাস, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৪৯।
৫৩। *তদেব,* পৃ. ১৬।
৫৪। ডবস্তারিত জানতে দেখুন, মুসা কালিম, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১২১-১৩১।
৫৫। গিরিন্দ্র নাথ দাস, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৪।
৫৬। *তদেব,* পৃ. ৪৭৫-৪৭৬।
৫৭। পঞ্চানন মণ্ডল, *পুঁথিপরিচয়,* ৪র্থ খণ্ড, (শান্তিনিকেতনঃ বিশ্বভারতী, ১৩৮৬), পৃ. ১।
৫৮। দীনেশচন্দ্র সেন (সং), *মৈমনসিংহ-গীতিকা,* ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, (কলকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩), পৃ. ২৭৭।
৫৯। *তদেব,* পৃ. ২৭৮।
৬০। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যেও ইতিবৃত্ত,* ৪র্থ খণ্ড (কলকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সি, ২০০০), ৩য় সং, পৃ. ২৪।
৬১। যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, "চট্টগ্রামের কয়েকজন মুসলমান কবি", *প্রবাসী,* ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, পৃ. ২২৫-২২৭।
৬২। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (সং ও সম্পা.), *বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবির পদমঞ্জুষা,* (কলকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪), পৃ. ২৯।
৬৩। তদেব, পৃ. ৩১।
৬৪। তদেব, পৃ. ৫৩।
৬৫। তদেব, পৃ. ১১৮।
৬৬। তদেব, পৃ. ১৩০-১৩১।
৬৭। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, Jadunath Sarkar, *History of Bengal*, (Patna: Janaki Prakashan, 1973) p. 368; অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন,* (কলকাতাঃ সাহিত্যলোক, ১৯৮৬), পৃ. ২৬৩।
৬৮। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৪।
৬৯। তদেব, পৃ. ১৪৫।
৭০। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (সং ও সম্পা.), *সাধক কবি রামপ্রসাদ সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী সমন্বিত,* (কলকাতাঃ ভট্টাচার্য এন্ড সন্স, ১৯৮৪), পৃ. ৩১৯।
৭১। চিত্তরঞ্জন দেব, "ভাওয়াইয়া গান ও বাউদিয়া সম্প্রদায়" *প্রবাসী,* ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬৩, পৃ. ৩৭১।
৭২। রমাকান্ত চক্রবর্তী, *শক্তিনাথ ঝা, গুরুঃ তত্ত্ব পূজা পরম্পরা,* (কলকাতাঃ অবভাস, ২০০৮), পৃ. ২০।
৭৩। চৈতন্যচরিতামৃত (কলকাতা। কলকাতাঃ বসুমাত, ১৯৯৭), পৃ. ১৩২।
৭৪। পুঁথি পরিচয়, ৩য় খণ্ড (১৩৬৯), পৃ. ৩১-৩৪।
৭৫। ডবস্তারিত জানতে দেখুন, সুধীর চক্রবর্তী, সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান, (কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫), পৃ. ১-২৭।
৭৬। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গ-প্রসঙ্গ,* (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০০১), পৃ. ১৪৭।

Published by

RAJSHAHI COLLEGE
Rajshahi 6000, Bangladesh
www.rc.gov.bd